Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ আয়েশা খাতুন

রোলঃ ২৩০৯০১২০৬৪৮

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ আয়েশা খাতুন

রোলঃ ২৩০৯০১২০৬৪৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি বিচার ব্যবস্থা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ আয়েশা খাতুন, আইডিঃ ২৩০৯০১২০৬৪৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি বিচার ব্যবস্থা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোছাঃ আয়েশা খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছাঃ আয়েশা খাতুন

আইডিঃ ২৩০৯০১২০৬৪৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বলতে কি বুঝায়.....6
২. বিচার ব্যবস্থার আদর্শ মানদণ্ড.....8
২.১ ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা.....8
২.২ একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য.....9
২.৩ ন্যায়, সমতা ও জবাবদিহিতা.....11
৩. ইসলামি শরিয়া আইন.....12
৩.১ শরিয়ার উৎস ও ভিত্তি.....12
৩.২ শরিয়া আইনের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আল-শরিয়াহ).....14
৩.৩ শরিয়া আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র.....17
৪. সেকুলার বা গণতান্ত্রিক আইন ব্যবস্থা.....20
৪.১ সেকুলার আইনের ধারণা.....20
৪.২ গণতান্ত্রিক আইনের কাঠামো.....20
৪.৩ উৎস ও বৈশিষ্ট্য.....23
৫. ইসলামি আইন বনাম সেকুলার/গণতান্ত্রিক আইন.....25
৫.১ মৌলিক পার্থক্য.....25
৫.২ ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি:.....27
৫.৩ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের পার্থক্য.....29
৬. শরিয়া বনাম সেকুলার আইনে মানবাধিকার.....32
৬.১ মানবাধিকারের ধারণা.....32
৬.২ ইসলামি আইনে মানবাধিকার.....32
৬.৩ সেকুলার আইনে মানবাধিকার.....34
৬.৪ তুলনামূলক পার্থক্য.....35
৭. শাস্তি ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা.....36

৭.১ ইসলামি শাস্তি ব্যবস্থা 36
৭.২ কিসাস.....39
৭.২ শাস্তির উদ্দেশ্য.....42
৭.৩ সামাজিক ভারসাম্য ও নিরাপত্তা.....43
৮. আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন.....46
৮.১ বিচারিক কাঠামো.....46
৮.২ বিচারকদের ভূমিকা.....47
৮.৩ প্রমাণ ও সাক্ষ্য ব্যবস্থা.....47
৯. সামাজিক অধপতন ও বিচার ব্যবস্থার প্রভাব.....49
৯.১ সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ.....49
৯.২ বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা ও প্রভাব.....51
৯.৩ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার সম্ভাব্য সমাধান.....52

১. ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বলতে কি বুঝায়

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা বলতে এমন ন্যায় ভিত্তিক আইন ও বিচার কাঠামোকে বোঝায় যা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধান ও রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহর ওপর গঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থা সাধারণত মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফ সাম্য সততা দায়িত্ব জবাবদিহিতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামি বিচার ব্যাবস্থা সাধারণত ৪ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ইসলামি বিচার ব্যবস্থা ৪ টি মূল উৎস হতে পরিচালিত হয়।

ক. আল কুরআন - ইসলামের সর্বোচ্চ মূল বিধান ও আইন সম্বলিত প্রধান গ্রন্থ।

খ. হাদীস/ সুন্নাহ - মহানবি (সঃ) এর কথা কাজ ও অনুমোদন সহ কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগের বিধানাবলি নির্দেশ করে।

গ. ইজমা - সাহাবি, সালাফে সালেহীনদের সহ পরবর্তী ইসলামি স্কলাদের সর্ব সম্মত মতামত নির্দেশ করে।

ঘ. কিয়াস - কুরআন ও হাদীসে সরাসরি উল্লেখ না থাকা বিষয়গুলির বিষয়ে ইসলামি স্কলারদের সর্বসম্মত গবেষণার এবং তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মুল হলো উপরিউক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক সমুন্নত রেখে বিচারক আদল (ন্যায়বিচার) ও ইহসান (উত্তম আচরণ) এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে যত দ্রুততার সহিত সম্ভব বিচার কার্য সম্পাদন করা।
ইসলামে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্টীয় ব্যক্তি বা ক্ষমতাধর কোনো ব্যক্তি কারো জন্য স্পেসিফিক বা ব্যতিক্রম/ আলাদা কোনো আইন প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন হয় না, ইসলামে

আইন বা বিচার সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ ও প্রণয়ন করা হয়। ইসলামে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করা হয় না সে যত হীন বা দরিদ্র সাধারণ মানুষই হোক না কেন। আর কোনো ব্যক্তির শাস্তি কমানো হয় না সে যতই অর্থ সম্পদ বা বিত্তশীল ক্ষমতা ধর সামাজিক প্রতিপত্তিরই মালিক হোক না কেন।

২. বিচার ব্যবস্থার আদর্শ মানদণ্ড

একটি রাষ্ট্র বা সমাজের স্থিতিশীলতা, শান্তি - শৃঙ্খলা, নীতি নৈতিকতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ন্যায় ইনসাফ ও জবাবদিহিতা ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য। বিচার ব্যবস্থা যদি সঠিক না হয়, তাহলে সমাজে অন্যায়, জুলুম, রাহাজানি, উগ্রতা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। তাই একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থার জন্য কিছু মৌলিক মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন, যেমন—ন্যায়বিচার, সমতা, জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও নীতি - নৈতিকতার সংমিশ্রণ ।

২.১ ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা

ন্যায়বিচার (Justice) বলতে এমন একটি ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যায় প্রতিহত হয়, সামাজিক নীতি নৈতিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার ন্যায্য অধিকার লাভ করে। এটি শুধু আইনগত বিষয় নয়, বরং একটি সামাজিক ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ, যা সমাজে নির্দিষ্ট ভারসাম্য রক্ষা ও শান্তি বজায় রাখে।

কুরআনের বর্ণিত হয়েছে - :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।”
— (সূরা আন-নাহল: ৯০)

এই আয়াত প্রমাণ করে, ন্যায়বিচার ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি এবং আল্লাহর সরাসরি নির্দেশনা। এই নির্দেশনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি প্রদশর্ন করেছেন। আল কুরআন ও রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহ আকড়ে ধরলে যাবতীয় ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের সফলতা অর্জন সম্ভব দুনিয়া ও আখিরাতে। ব্যক্তি যদি অমুসলিম ও হয় তাহলেও তার জীবনের দুনিয়াতে সফলতা সম্ভব।
যদি আল্লাহর দেওয়া ন্যায় ও ইনসাফ মানুষ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়ন করে তাহলে সেই সমাজ বা রাষ্ট্র দুনিয়ার সবথেকে সফলতা অর্জনে সম্ভব হবে, উন্নতি ও অগ্রগতির চুড়ান্ত শিখড়ে অবস্থান করবে।

২.২ একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. স্বাধীনতা - বিচার বিভাগকে অন্যায়, অবিচার, কলুষতা, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

২. নিরপেক্ষতা - বিচারককে পক্ষপাতহীন হতে হবে এবং সত্যে, ন্যায়, আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

৩. আইনের শাসন - আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান—ধনী-গরিব, ক্ষমতাবান-দুর্বল, সবল-দূর্বল ইত্যাদি

৪. দ্রুত বিচার - বিচার বিলম্বিত হলে তা অনেক সময় অন্যায়ের সমান হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য সঠিক ন্যায় ওইনসাপের উপর ভিত্তি করে যত দ্রুততার সহিত সম্ভব বিচার কার্য সম্পাদন করতে হবে।

৫. প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত - অনুমান নয়, বরং অটুট নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে।

৬. সহজপ্রাপ্যতা ও স্বচ্ছতা - সকল প্রকার শ্রেণি পেশার মানুষ যেন সহজে ন্যায় বিচার পায় এবং বিচার প্রক্রিয়া জনগণের কাছে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ،ِ
فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ،ِ
وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ،ِ
وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.ِ

অর্থ:

“বিচারক তিন প্রকার:

একজন জান্নাতে যাবে এবং দু’জন জাহান্নামে যাবে।

যে ব্যক্তি সত্যকে জেনেছে এবং সে অনুযায়ী বিচার করেছে, সে জান্নাতে যাবে।

আর যে ব্যক্তি সত্য জেনেও সে অনুযায়ী বিচার করেনি এবং অন্যায়ভাবে রায় দিয়েছে, সে জাহান্নামে যাবে।

আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিচার করেছে, সেও জাহান্নামে যাবে।”

উৎস: সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং ৩৫৭৩)

অর্থাৎ, ন্যায়ভিত্তিক ও সঠিক বিচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস:

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

অর্থ: “যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।” — (সহীহ বুখারি)

এই হাদীসের প্রেক্ষাপট হলো:

মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে বনু মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করেছিল। সে সমাজে মাখযুম গোত্র এক ধরনের সম্মানিত পরিবার থেকে ছিল, তাই লোকেরা চেয়েছিল যেন তার এই গুরুতর শাস্তি (হাত কাটা) কার্যকর না করা হয়।

এজন্য তারা উসামা ইবনে যায়েদ-কে অনুরোধ করে, কারণ তিনি নবী (সা.)-এর খুব প্রিয় ছিলেন। উসামা (রা.) নবী (সা.)-এর কাছে সুপারিশ করলে নবী (সা.) এতে অসন্তুষ্ট হন। তার মুখাবয়ব লালবর্ণ ধারণ করেন।

তখন নবী (সা.) কী বলেছিলেন?

তিনি বলেন:

“তোমরা কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ?

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছিল এই কারণে যে, তারা সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত।”

আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান—ধনী, গরিব, আত্মীয়-স্বজন পরিচিত-অপরিচিত বিচার ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব হলে সমাজ ধ্বংস হয়
ইসলামে ন্যায়বিচার অত্যন্ত কঠোর ও নিরপেক্ষ

এতে প্রমাণিত হয়, ইসলামে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি, সম্মান বা মর্যাদার অধিকারি বা আত্মীয় স্বজনের জন্য আইনের ব্যতিক্রম/ব্যত্যয় নেই।

২.৩ ন্যায়, সমতা ও জবাবদিহিতা

ন্যায়বিচারের মূল তিনটি স্তম্ভ হলো—ন্যায়, সমতা ও জবাবদিহিতা।
ন্যায় – সত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করা।
সমতা – সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান।
জবাবদিহিতা – প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের জন্য আল্লাহর কাছে নিশ্চয় জবাবদিহি করবে।

কুরআনের বর্ণিত হয়েছে:
:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও—যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়।” — (সূরা আন-নিসা ৪: ১৩৫)

হাদীস:
كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته

অর্থ: “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” — (সহীহ বুখারি, মুসলিম)

৩. ইসলামি শরিয়া আইন

ইসলামি শরিয়া আইন হলো আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিচারিক সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

৩.১ শরিয়ার উৎস ও ভিত্তি

শরিয়া আইন চারটি প্রধান উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত—

১. আল-কুরআন – আল্লাহর বাণী

২. হাদীস (সুন্নাহ) – রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শ

৩. ইজমা – উলামাদের ঐকমত্য

৪. কিয়াস – তুলনামূলক যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত

কুরআনের বর্ণিত হয়েছে

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।”

— (সূরা আন-নিসা ৪: ৫৯)

এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আমর ইবনুল আস (রা.), এবং এটি পাওয়া যায় সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম-এ।

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ،

وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

অর্থ:

“যখন কোনো বিচারক (বা মুজতাহিদ) ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তখন তার জন্য দুইটি সওয়াব।

আর যখন সে ইজতিহাদ করে কিন্তু ভুল করে, তখনও তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে।”

এই হাদীসের ব্যাখ্যা

এখানে “হাকিম” বলতে শুধু বিচারক না—বরং আলেম বা মুজতাহিদ, যারা কুরআন-হাদীস থেকে বিধান বের করেন।

“ইজতিহাদ” মানে হলো গভীর গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এজন্য:

সঠিক সিদ্ধান্ত → ২ সওয়াব

ভুল সিদ্ধান্ত (সৎ প্রচেষ্টা থাকলে) → ১ সওয়াব

এই আয়াতটি কিয়াস নির্দেশ করে। প্রথমত কোনো ফিকহ বিষায়ক বা বিচারিক প্রক্রিয়ায় আল কুরআন থেকে সমাধান খোজা তারপর হাদীস অধ্যায়নের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা তারপর সমাধান না পেলে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারলে কিয়াসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সামধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এখানে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য সওয়াব রয়েছে আর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সওয়াব নির্ধারিত

এখানে রাসূল (সঃ) বলেছেন সমাধান করলে ব্যক্তিগন ২ টা সওয়াব পাবেন আর সমাধান ভুল হলে একটি সওয়াব পাবেন।

৩.২ শরিয়া আইনের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আল-শরিয়াহ)

শরিয়া আইনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর ও বান্দার হক সমুন্নত রেখে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা। এটি ব্যক্তি বা সমাজের শতাব্দীর পর শতাব্দী পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণ করে—

১. ধর্ম (দীন)
২. জীবন (নফস)
৩. বুদ্ধি (আকল)
৪. বংশ (নাসল)
৫. সম্পদ (মাল)

কুরআনের আয়াত:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

অর্থ: "কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।"
—(সূরা আল-বাকারা: ১৭৯)

কিয়াস মানে হলো—কুরআন ও হাদীসে সরাসরি কোনো সমাধান না থাকলে, মিলযুক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নতুন মাসআলার হুকুম নির্ধারণ করা।
এভাবে কিয়াস আসলে শরিয়ার উদ্দেশ্যগুলোকে সময়ের সাথে কার্যকর রাখে।
১.ধর্ম (দীন) সংরক্ষণ
কিয়াসের মাধ্যমে এমন নতুন বিষয়গুলোর হুকুম বের করা হয়, যা দ্বীনের ক্ষতি করতে পারে।
যেমন:
মাদকদ্রব্য (ড্রাগস), নেশা উদ্রেককারি বিষয়বস্তুসমূহ কুরআনে সরাসরি নাম উল্লেখ নেই
কিন্তু মদের সাথে তুলনা করে কিয়াস করা হয়
তাই এগুলো হারাম ঘোষণা করা হয়। এতে ঈমান ও ইবাদত সুরক্ষিত থাকে। সমাজকে কলুষতা থেকে মুক্ত করে।

২.জীবন (নফস) সংরক্ষণ

সূরা আল-বাকারা ১৭৯-এ বলা হয়েছে:

“কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে”

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

“আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম।” — সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৫

কারণ এখানে সরাসরি শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতের মূল কথা হলো—
ন্যায়বিচারে সমতা

১.সমান শাস্তির নীতি: কেউ যেমন ক্ষতি করবে তেমন নির্ধারিত শাস্তি পাবে এতে সমাজে অন্যায় কমে যায়, সাধারণ মানুষ হত্যা সরাসরি প্রতক্ষ করায় শাস্তির ভয় মানুষের মনে প্রবেশ করবে।

২. জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষা :মানুষ জানে অপরাধ করলে একইভাবে শাস্তি পেতে হবে তাই হত্যা কমে যায়

৩. প্রতিশোধ সীমাবদ্ধ করা: ইসলাম অযৌক্তিক প্রতিশোধ বন্ধ করে

“একটা মারলে দশটা মারা” — এটা নিষিদ্ধ

বরং যতটুকু ক্ষতি, ততটুকুই প্রতিকার, ততটুকুই শাস্তি প্রদান, তারপর স্বাভাবিক জীবনে ফেরা।

৪. ক্ষমার সুযোগ

কিসাস বাধ্যতামূলক নয়

ভুক্তভোগী বা বুক্তভোগীর পরিবার চাইলে ক্ষমা করতে পারে বা দিয়াত (রক্তপণ) নিতে পারে

এতে ন্যায় ও দয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন হয়। কেউ যদি রক্তপন আদায় করে কিসাস রহিত করে দেয় বা অপরাধী/হত্যাকারীকে দুনিয়াতে মাপ করে দেয় ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদানের আশা করে তাহলে ইসলামে এটির ক্ষমা ও মহানুভবতার উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

সুতরাং "জানের বদলে জান এটি কিসাসের মূলনীতি।

এটির লক্ষ্য জীবন রক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অপরাধ সমূলে দমন করা, পরিণতির উদাহরণ সৃষ্টি করা সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

★ কিয়াসের মাধ্যমে:

নতুন ধরনের অপরাধ (যেমন আধুনিক অস্ত্র দিয়ে হত্যা)

এগুলোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয় পূর্বের নিয়মের সাথে মিলিয়ে। জানের বদলে জান, মালের বদলে মাল ফলে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে।

৩. বুদ্ধি (আকল) সংরক্ষণ

যে কোনো কিছু যা মানুষের চিন্তা-শক্তি নষ্ট করে—তা কিয়াসের মাধ্যমে হারাম করা হয়।

ইয়াবা, হেরোইন, মারিজুয়ানা ও যাবতীয় মাদকদ্রব্য ইত্যাদি

মদের মতোই ক্ষতিকর → তাই কিয়াসে হারাম, শাস্তি ও প্রতিকার বা অপরাধ দমনের মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য ও অপরাধীর পুনরায় ব্যক্তিজীবনে ফেরার ব্যবস্থা করা। এতে মানুষের মস্তিষ্ক ও বিবেক রক্ষা পায় ও মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ও পরিবেশে অভ্যস্থ হতে পারে।

৪. বংশ (নাসল) সংরক্ষণ

কিয়াসের মাধ্যমে পরিবার ও বংশ রক্ষার জন্য নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।

আধুনিক অবৈধ সম্পর্ক বা প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যভিচার

এগুলোকে যিনা (ব্যভিচার)-এর সাথে তুলনা করে নিষিদ্ধ করা হয় ও নির্ধারিত শাস্তি জনসম্মুখে কার্যকর করা হয়। এতে সমাজের নৈতিকতা ও বংশধারা ঠিক থাকে। সমাজের মানুষ এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করার কারনে অপরাধে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন থাকে।

৫. সম্পদ (মাল) সংরক্ষণ

নতুন ধরনের অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রেও কিয়াস প্রয়োগ হয়। যেমন: অনলাইন প্রতারণা, ডিজিটাল জালিয়াতি, সম্পদ কুক্ষিগত, সমাজের যাবতীয় প্রতারণা, এগুলোকে চুরি বা প্রতারণার সাথে মিলিয়ে শাস্তির আওতায় আনা হয়। এতে মানুষের সম্পদ নিরাপদ থাকে।

কুরআন ও হাদীস হলো মূল ভিত্তি
কিয়াস সেই ভিত্তিকে সময়ের সাথে প্রযোজ্য করে তোলে ও সমাজে বাস্তবায়ন করে, ফলে শরিয়ার ৫টি উদ্দেশ্য (দীন, নফস, আকল, নাসল, মাল) সব যুগেই সামাজিকভাবে সংরক্ষিত থাকে। কিয়াস হলো শরিয়া আইনের "প্রয়োগের হাতিয়ার", যা মানব সমাজ ও মানবকল্যাণকে সব যুগে জীবিত রাখে। এটি প্রমাণ করে যে, শরিয়া আইন সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত।

৩.৩ শরিয়া আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র

শরিয়া আইন মানুষের জীবনের সব দিককে অন্তর্ভুক্ত করে—
১. ইবাদত— নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত
২. মুয়ামালাত – ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি ও লেনদেন
৩. পারিবারিক আইন – বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার
৪. ফৌজদারি আইন – অপরাধ ও শাস্তি (চুরি, হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه

অর্থ: "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি—যতদিন তোমরা এগুলো আঁকড়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত

খিলাফতে রাশেদার যুগে ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)

ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়বিচারের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণগুলোর মধ্যে খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর শাসনামল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন ছিল সুদৃঢ় এবং শাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা হতো না। নিচে তাঁর ন্যায়বিচারের কয়েকটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো—

১. আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা (বিচারকের সামনে খলিফা)
ইতিহাসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি খলিফা উমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে একটি মামলার প্রেক্ষিতে আদালতে উপস্থিত হন। বিচারক উভয় পক্ষকে সমানভাবে দাঁড়াতে বলেন এবং খলিফাকে কোনো বিশেষ সম্মানসূচক আচরণ না করার নির্দেশ দেন। উমর (রা.) এতে অসন্তোষ না দেখিয়ে বরং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, বিচারক ন্যায়বিচারের সঠিক পথেই আছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামী বিচারব্যবস্থায় আইনের চোখে সবাই সমান, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও আইনের ঊর্ধ্বে নন। (উৎস: আল-খারাজ, তাবাকাত ইবনে সা'দ)

২. মিশরের গভর্নরের পুত্রের বিরুদ্ধে বিচারের ঘটনা:

এটি উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচারের সবচেয়ে বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ঘটনাগুলোর একটি। মিশরের গভর্নর আমর ইবনে আল-আস (রা.)-এর পুত্র এক কপটিক (খ্রিস্টান) যুবককে অন্যায়ভাবে প্রহার করে এবং বলে, “আমি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান।”

ভুক্তভোগী দীর্ঘ সময় ও পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায় এসে খলিফা উমর (রা.)-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। তখন উমর (রা.) গভর্নর ও তার পুত্রকে মদিনায় ডেকে পাঠান। তিনি ভুক্তভোগীকে নিজ হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দেন, ফলে সে গভর্নরের পুত্রকে প্রহার করে। এরপর উমর (রা.) গভর্নরকে উদ্দেশ করে ঐতিহাসিক উক্তি করেন—

“তোমরা কবে থেকে মানুষকে দাস বানালে, অথচ তাদের মায়েরা তাদের স্বাধীনভাবে জন্ম দিয়েছিল?”

এই ঘটনা প্রমাণ করে:
ক্ষমতার অপব্যবহার কঠোরভাবে দমন করা হয়, শাসকের পরিবারও আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সকল নাগরিক—মুসলিম বা অমুসলিম—সমান ন্যায়বিচার পায়। (উৎস: ফুতুহ আল-বুলদান)

৩. মদ্যপানের অপরাধে আত্মীয়ের শাস্তি

ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ আছে, উমর (রা.)-এর শাসনামলে তাঁর নিকট আত্মীয় (কিছু বর্ণনায় পুত্র বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) মদ্যপানের অপরাধে অভিযুক্ত হলে তিনি শরিয়া অনুযায়ী নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করেন।
উল্লেখযোগ্য যে, মদ্যপানের শাস্তি সম্পর্কে ফিকহে ভিন্ন মত থাকলেও (৪০ বা ৮০ বেত্রাঘাত), উমর (রা.) শাসনামলে ৮০ বেত্রাঘাত কার্যকর করার নজির পাওয়া যায়।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে:
আত্মীয়তার কারণে শাস্তি কমানো হয়নি, শরিয়া আইন নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। (উৎস: সহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

উপরোক্ত ঘটনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে ন্যায়বিচার ছিল বাস্তবমুখী, নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন। তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে শাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তাঁর এই আদর্শ শাসনব্যবস্থা আজও ন্যায়, সমতা ও মানবাধিকারের এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়—
আইনের সামনে সবাই সমান, শাসকও জবাবদিহিতার বাইরে নয়, সব যুগেই ইসলামে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়, সমতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। ইসলামি শরিয়া আইন এই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা প্রদান করে। কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

৪. সেকুলার বা গণতান্ত্রিক আইন ব্যবস্থা

৪.১ সেকুলার আইনের ধারণা

সেকুলার আইন এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন ধর্মীয় নির্দেশনা থেকে পৃথক থেকে মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এখানে সার্বভৌমত্ব মানুষের—অর্থাৎ জনগণের। অর্থাৎ ক্ষমতার মূল উৎস জনগনের হাতে এটা জনগণকে বিশ্বাস করানো হয়। কিন্তু বাস্তবে সমাজের কিছু এলিট শ্রেণীর মানুষের চিন্তাধারা, ও ইচ্ছা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যটা জনগন না বুঝেই গিলে।

ইউরোপে চার্চের প্রভাব কমানোর আন্দোলনের মাধ্যমে সেকুলারিজমের উত্থান ঘটে, বিশেষ করে French Revolution-এর পর রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ একটি মৌলিক নীতি হয়ে দাঁড়ায়।

সেকুল্যর আইনের মূল বৈশিষ্ট্য:
ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক থাকবে, আইন হবে মানবপ্রণীত, ব্যক্তিস্বাধীনতা সবথেকে বেশি গুরুত্ব পাবে, ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে।

৪.২ গণতান্ত্রিক আইনের কাঠামো

গণতান্ত্রিক আইনব্যবস্থা জনগণের প্রতিনিধিদের ও ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এখানে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা জনগণের ভোটাধিকার এর মাধ্যমে ন্যস্ত থাকে।

গনতান্ত্রিক আইনের প্রধান কাঠামো:
১. সংবিধান
২. সংসদ (আইন প্রণয়নকারী)
৩.নির্বাহী বিভাগ

৪.স্বাধীন বিচার বিভাগ

গণতান্ত্রিক আইনের কাঠামো সাধারণত এই চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থেকে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করে। এগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. সংবিধান

সংবিধান হলো একটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানবরচিত সর্বোচ্চ আইন। এতে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও সীমা নির্ধারণ করা থাকে কিছু মানুষের নিদৃষ্ট ঠিক করে দেওয়া সীমার ওপর ভিত্তি করে। অন্য সব আইন সংবিধানের অধীনস্থ—অর্থাৎ কোনো আইন সংবিধানের বিরুদ্ধে হলে তা বাতিলযোগ্য।

অর্থাৎ কতিপয় রক্ত মাংসে গড়া ব্যক্তি-বর্গ মানুষের সীমা পরিসীমা নিদিষ্ট করে দিয়েছে যে মানুষের নীতি নৈতিকতা কেমন হবে, কোন অপরাধের কী শাস্তি দেওয়া উচিত সে অনুযায়ী তারা মানদণ্ড তৈরি করে জনগনের উপর চাপিয়ে দিয়ে এইটাই গনতন্ত্র বলে উপস্থাপন করেছে আর সেটা মানুষ নিজেদের অধিক ব্যক্তিদের মতামত মনে করে সন্তুষ্ট।

২. সংসদ (আইন প্রণয়নকারী)

সংসদ হলো জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমষ্টি, যারা আইন তৈরি করে। জনগণের চাহিদা ও সমস্যার ভিত্তিতে নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন সংশোধন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতিনির্ধারণ করা সংসদের প্রধান কাজ। জনগন প্রতিনিধি তৈরি করে তারপর প্রতিনিধি সংসদে যায় নতুন আইনের বিল তৈরি করে ওখানে সংসদের অধিক ব্যক্তিদের ইচ্ছা বা ভোট পেলে যেকোনো আইন বা বিল পাশ হয় আর অধিক ভোট না পেলে বিলটি বা অইনটি বাতিল হয়। তাহলে এখানে যে অধিক জনগনের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রেরণ করে বিলটি উপস্থাপন করে লাভটা কি হলো সেই তো সংসদের সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী অইন বাস্তবায়ন হলো।

৩. নির্বাহী বিভাগ

নির্বাহী বিভাগ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। আইন প্রণয়নের বা বিল পাশের পর সেটা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বাস্তবায়নে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তারা সংসদে প্রণীত আইন কার্যকর করে এবং দেশের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করে।

৪. স্বাধীন বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা দেয় এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। এটি অন্যান্য দুই বিভাগের (সংসদ ও নির্বাহী) থেকে স্বাধীন থাকে, যাতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায়। আদালত আইন লঙ্ঘনের বিচার করে এবং প্রয়োজনে অন্য বিভাগের কার্যক্রমও পর্যালোচনা করতে পারে।

এখানে আবার সরকার মন্ত্রণালয়ের ব্যাক্তিগণ নিজের ক্ষমতার মাধ্যমে যে কারও উপর নিজের ইচ্ছামত দমন নিপিড়নের মাধ্যমে আইন বাস্তবায়ন করতে পারে। ফলে অপরাধী আইনের ফাক ফোকর দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে অর্থবিত্ত ও ক্ষমতা বলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে।

সংক্ষেপে, এই চারটি স্তম্ভ একে অপরের মধ্যে ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ (checks and balances) বজায় রেখে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয় কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিতে অপারগ অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার জালে আস্বাদিত।

সাধারণত গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সমাদৃত আব্রাহাম লিংকন।

আব্রাহাম লিংকন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট এবং ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। তিনি ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে তিনি দেশের ঐক্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দরুন গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। লিংকন দাসপ্রথা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এবং “Emancipation Proclamation” জারির মাধ্যমে দাসপ্রথা অবসানের পথ সুগম করেন। গণতন্ত্রের অন্যতম কর্ণধার ও প্রতিষ্ঠাতা-চিন্তাবিদ হিসেবে

তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি গণতন্ত্রকে "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন, যা আজও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ১৮৬৫ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। তার জীবন ও কর্ম মানবাধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ ব্যক্তির বানানো নীতি নৈতিকতার আলোকে মানুষের জীবনমান গঠিত ও পরিচালিত হবে। একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষ নির্ধারণ করে দিবে মানুষের জাগতিক ও আদর্শিক ন্যায় নৈতিকতা ও নীতিভিত্তিক মানদন্ড আর সাধারণ মানুষ এগুলো মেনে নিতে বাধ্য বিনা বাক্যব্যয়ে। এরা মুখে শান্তি, ন্যায় ও ইনসাফের বুলি আওড়াতে থাকে কিন্তু বাস্তবে নিজেরাই অশান্তি অন্যায়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

এই ব্যবস্থায় "জনগণই ক্ষমতার উৎস"—এটি একটি মৌলিক নীতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো আইন বা ন্যায় বিচারের মানদন্ড নির্নিত ও বাস্তবায়িত করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই নীতি জনগণকে গলাদ্ধকরণের মাধ্যমে জনগনকে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আশ্বাস রাখতে নিশ্চিত করে।

৪.৩ উৎস ও বৈশিষ্ট্য

গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎস হলো মানবরচিত সংবিধান সংসদীয় আইন বিচারিক রায় আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য

পরিবর্তনশীল ও সময়ভিত্তিক - সেকুলার এমন এক নীতি যেটি নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে মানদন্ড তৈরি করে আবার নিজেদের প্রয়োজনেই সেটি বাতিল করে, কিন্তু আল্লাহর আইন পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সম্ভব নয়।

মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন - সেকুলার ব্যবস্তায় মানুষকে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলনের আশ্বাস গলাদ্ধকরন করানো হয় কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কতিপয় ব্যক্তিদের বানানো নীতি নৈতিকতার মানদণ্ড চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা - এই ব্যবস্থায় দেখানো হয় গনতান্ত্রিক কাঠামো সকল ধর্মের প্রতি উদার। কিন্তু এরা নিজেরাই এই গনতান্ত্রিক বা সেকুলারিজম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে এই ধর্মের পুজায় সবচেয়ে বেশি তৎপর ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র নিজের সেকুলার ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের প্রতি কখনোই উদারতা প্রকাশ করে না। শুধুমাত্র মুখে উদারতা প্রকাশ করে কিন্তু যখনই অন্য ধর্ম সেকুলার ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে তখনই দেখা যাবে কীভাবে অন্য ধর্মকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপিড়ীত করে সেকুলার ধর্মকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

ব্যক্তি অধিকারের উপর গুরুত্ব - এই কাঠামোতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যক্তি অধিকারের উপর কিন্তু আদতে বাস্তবে কেউ ব্যক্তি অধিকার পালন করলে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপক্ষে গেলে তাকে সেকুলার ব্যবস্থার মাধ্যমে মামলা হামলা ইত্যাদির মাধ্যমে নিশ্চুপ ও অদৃশ্যমান করিয়ে দেওয়া হয়।

সমসাময়িক

বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলো—যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স—সেকুলার আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত দেশগুলোতে অন্য ধর্ম পালনে কঠোর বাধা ও বিধিনিষেধ এর সম্মুখীন হতে হয়। অনেক মুসলিম দেশেও আংশিক সেকুলার কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে ইউরোপ আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণে। তারা অন্যান্য মুসলিম ও অমুসলিম দেশে নিজেদের ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের পছন্দমাফিক পাপেট মন্ত্রী মিনিস্টার বানিয়ে তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতই দেশ ও আইন পরিচালনা করে।

৫. ইসলামি আইন বনাম সেকুলার/গণতান্ত্রিক আইন

৫.১ মৌলিক পার্থক্য

ইসলামি আইন সেকুলার আইনেই মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামি আইন -
সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আল্লাহ এই ভূমন্ডল ও মহাকাশসহ যাবতীয় মানুষ ও পশুপাখি সহ পৃথিবীতে যাবতীয় বিচরণশীল জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। এগুলো সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ফিতরাহের জ্ঞান দান করেছেন এবং মানুষকে পৃথিবীর সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে আক্ষায়িত করেছেন। পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণির থেকে মানুষের বিবেক বিবেচনা সহ নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান দান করেছেন যেগুলো আর অন্য কোনো প্রাণিকে দান করেননি। মানুষের নীতিগত বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সবচেয়ে বেশি অবগত রয়েছেন । মানুষ কোনটাতে বেশি প্রলোভিত বা প্রভাবিত বা ভীতির সঞ্চার হয় সেটি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সবচেয়ে বেশি অবগত। এজন্য তিনি একটি নিদিষ্ট মানদণ্ড স্থাপন করে আইন প্রণয়ন করেছেন মানুষের পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ব্যতীত জীবন যাপনের জন্য। ইসলামি আইনে আইন প্রনয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। মূল উৎস হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কর্তৃক প্রেরিত কুরআন ও তার রসূলের হাদীস। এগুলো প্রেরণের উদ্দেশ্য মানবজাতির আখিরাত ও দুনিয়াবি কল্যাণ অর্জন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আইন চিরস্থায়ী এটি দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত আর কেনো পরিবর্তন ও পরিমার্জন বা সংশোধন হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কর্তৃক এই আইন চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল। সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির ত্রুটি বিচ্যুতি ও সংশোধন বিষায়ক বিষয়ে অবশ্যই অবগত রয়েছেন। এজন্যই তিনি আইন প্রদান করেছেন কখনো শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অথবা কখনো আখিরাতের উত্তম বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বান্দাকে অবগত/আশ্বাস করার মাধ্যমে। অর্থাৎ একজন সৃষ্টিকর্তাই জানেন তার সৃষ্টির বিষয়বস্তু কোনটাতে প্রভাবিত বা উত্তম বিনিময় লাভে তৎপর হবে এবং নীতিবিরোধী কাজ হতে বিরত থাকবে। সেজন্যই তিনি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল আই প্রণয়ন করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইসলামে একমাত্র আল্লাহর প্রনিত আইন ছাড়া কেউ ব্যক্তিগত

কারণে কারও ওপর কোনো অত্যাধিক জুলুম বা আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখে না। আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার। আল্লহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তায়লার এই আইনের চুড়ান্ত গন্তব্য দুনিয়াবি কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে আখিরাতের চুড়ান্ত সফলতা অর্জন করা।

আইন প্রণয় সম্পকৃত কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

“নিশ্চয়ই হুকুম (আইন প্রণয়ন) একমাত্র আল্লাহরই।”
— (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

আরও বলা হয়েছে:
“তারা কি জাহেলিয়াতের আইন কামনা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানকারী আর কে?”
— (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৫০)

“যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।”
— (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪৪)

➡ এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, মানবপ্রণীত আইন যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীতে দাঁড়ায়, তাহলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

সেকুলার বা গণতান্ত্রিক আইন:

এই আইনের মূল উৎস হিসাবে জনগণকে বিশ্বাস করানো হয় কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এই আইনের মূল উৎস এলিট শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তিবর্গ। তাদের অর্থবিত্ত ও পছন্দ অনুযায়ী আইন যখন তখন প্রনিত ও বাস্তবায়িত করে। নিজেদের কাছে উত্তম মনে হলে আইন বাস্তবায়ন করবে আবার কিছু সময় পর ওইটাই নীতিবিরুদ্ধ মনে হওয়ার কারণে সেই আইনই পাল্টে নতুন আইন প্রবর্তন করবে, এভাবেই প্রতিবার চলতে থাকবে। সেকুলার আইনের মূল উদ্দেশ্য দুনিয়াবি সফলতা অর্জন করা। এই আইনের নীতি নৈতিকতার

মানদণ্ড কিছু সময় পর পর পরিবর্তনশীল। এই আইনের সার্বভৌমত্ব পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য দুনিয়াবি বিষয়াবলি সাময়িক সময়ের জন্য সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে দুনিয়াবি সফলতা অর্জন করা। এখানে শান্তি বিষায়ক শব্দাবলি উচ্চারিত হলেও সমাজের বা রাষ্ট্রপর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার জন্য মূলত প্রধান দায়ী এই সেকুলার আইন তারাই অশান্তির কর্ণধার। এই আইনে সাময়িক সময়ের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেও দীর্ঘমেয়াদে সমাজ রাষ্ট্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই আইনের প্রণয়ন প্রথমে পরবিবারের ভীত নষ্ট করে অতপর সমাজ তারপর রাষ্ট্রকে কলাপ্স করে স্থায়িভাবে।

৫.২ ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি:

★ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি :

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
ইসলামে ন্যায়বিচার একটি ইবাদত এবং আল্লাহর নির্দেশ:
“নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”— (সূরা আন-নাহল ১৬: ৯০)

“হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে- পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।”— (সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)

হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন:
“সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে... তাদের মধ্যে একজন হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক।”— (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আরও একটি হাদীস:
“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, তারা শক্তিশালীকে ছেড়ে দিত আর দুর্বলকে শাস্তি দিত।”— (সহীহ বুখারী)

খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে:

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর কাছে
এক মিসরীয় নাগরিক গভর্নরের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, তিনি গভর্নরের ছেলেকে শাস্তি দেন এবং বলেন:

“তোমরা কবে থেকে মানুষকে দাস বানালে, অথচ তাদের মায়েরা স্বাধীন জন্ম দিয়েছিল?”

খলিফা আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) হতে বর্ণিত:

এক ইহুদির সাথে মামলায় বিচারকের সামনে সাধারণ নাগরিকের মতো দাঁড়িয়ে প্রমাণের অভাবে মামলায় হেরে যান—এটি আইনের সমতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

★সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি:
সেকুলার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার নির্ভর করে মানবাধিকার অর্থাৎ সকলের অধিকার সমান এই বুলি আওড়িয়ে সামাজিক চুক্তি রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ এর উপর। তবে সাধারণত বাস্তবে একেবারেই বিপরীত পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার প্রভাব, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ অর্থাৎ ধনী দারিদ্রের বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়াবলি ন্যায়বিচার বা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এবং এই আইনের নীয়ম নীতির বেড়াজালে পিষ্ট হয়ে নিরুপায় সৎ ব্যক্তি সঠিক

বিচার পেতে ব্যর্থ হয় ও সঠিক বিচারের আশায় আদালতের বা মানুষের দ্বারে দ্বারে চরকি ঘোরা ঘুরতে থাকে বছরের পর বছর কিন্তু সঠিক বিচার নিশ্চিত হয় না। আবার স্বাক্ষ্য প্রমান থাকা অবস্থায় ও ধনী অপরাধী ব্যক্তিবর্গদ্বয় আইনের ফাক ফোকর দিয়ে বের হয়ে যায় সাময়িক সময়ের মধ্যেই। অর্থাৎ এই সেকুলার বিচারিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারি মানুষের জন্য নির্ধারিত। মুকে মানবাধিকারের বুলি আওড়ালেও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করে না এই সেকুলার ব্যবস্থা। শিশু বাচ্চা কোনো কারণে কান্না করলে সাময়িক সময় বাচ্চাকে কান্না হতে বিরত রাখার জন্য যেমন বাচ্চার সামনে ললিপপ এপ্রোচ করাই যথেষ্ট, সাময়িক সময়ের জন্য বাচ্চাটা কান্নার আসল কারণ ভুলে অতি সন্তুষ্টচিত্তে ললিপপ খাওয়ার আগ্রহী হয় এবং অত্যাধিক খুশি হয়। ঠিক তেমনি এই সেকুলার ব্যবস্থায় মানবাধিকার বা শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সাময়িক সময়ে মুখ বন্ধ করার জন্য সাধারণ জনগণকে এই মানবাধিকারের ললিপপ গলাধঃকরণ করা হয় যেন জনগন দীর্ঘমেয়াদের যাবতীয় বিষয়াবলি ভুলে যায় এবং ক্ষতির দিকে ধাবিত হয়।

৫.৩ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের পার্থক্য

ইসলামি আইনের আইনদাতা বা আইন প্রণয়নকারী একক ও একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এবং এটির উৎস কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এবং ফিকহ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন বিজ্ঞ আলেম ওলামাগণ। এই আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব নয়। এই আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্য ন্যায়, নৈতিকতা ও আখিরাতের চুড়ান্ত সফলতা অর্জন করা।

সেকুলার আইনের আইনদাতা ও আইন প্রণয়নকারি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংসদ/মানুষ এবং এটির ভিত্তি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অর্থাৎ অধিকাংশের সহমত। এই আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহজসাধ্য অর্থাৎ সহজে পরিবর্তনযোগ্য। এটির চুড়ান্ত উদ্দেশ্য দুনিয়াবি সাময়িক সফলতা অর্জন করা।

ইসলাম বনাম সেকুলার ব্যবস্থার সাংঘর্ষিক বিশ্লেষণ:

ইসলামের দৃষ্টিতে:
সার্বভৌমত্ব আল্লাহর
আইন প্রণয়ন একমাত্র আল্লাহর অধিকার

অন্যদিকে সেকুলার ব্যবস্থায়:
সার্বভৌমত্ব মানুষের
আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের

এই মৌলিক পার্থক্য থেকেই ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় ও সেকুলার বিচার ব্যবস্থার সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়।

কুরআনের বর্ণিত হয়েছে :
“তিনি (আল্লাহ) তাঁর হুকুমে কাউকে শরিক করেন না।”
— (সূরা আল-কাহফ ১৮:২৬)

অর্থাৎ, আইন প্রণয়নে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে
বর্তমান বিশ্বে অনেক মুসলিম দেশ মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে আল্লাহর প্রেরিত শরিয়া বিচার ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে। তবে এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে — কেউ এটাকে বাস্তবতার সাথে সমন্বয় বলে, কেউ এটাকে শরিয়াহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি বলে, বাস্তবেই এটা শরিয়াহর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি।

ইসলামি আইন ও সেকুলার আইন উভয়ের লক্ষ্য সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হলেও তাদের ভিত্তি, উৎস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। যা একে অপরের বিপরীতে সাংঘর্ষিক। সৃষ্টিশীল বিষয়াদি নিয়ে সৃষ্টিকর্তারই তো সবচেয়ে বেশি অবগত

থাকা উচিত নাকি তার সৃষ্ট বিষয়াদি নিজের বিষয়ে অধিক অবগত থাকবে যেমন তার সৃষ্টিশীল বিষয়ের নীতি নৈতিকতার সমন্বয় ফিতরাহের বিষয়াদি ইত্যাদি বিষয়ে । কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেখা যায়, ইসলামি আইন আল্লাহপ্রদত্ত হওয়ায় তা সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারের মানদণ্ড হিসেবে সর্বস্তরে বিবেচিত, যেখানে সেকুলার আইন মানবপ্রণীত হওয়ায় তা পরিবর্তনশীল ও সীমাবদ্ধ ও বান্দার সম্পূর্ণ হক আদায়ে অকৃতকার্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

৬. শরিয়া বনাম সেকুলার আইনে মানবাধিকার

৬.১ মানবাধিকারের ধারণা

মানবাধিকার বলতে এমন মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে বোঝায় যা প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করে। যেমন—জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা।

আধুনিক বিশ্বে মানবাধিকারের ধারণা প্রধানত জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR, 1948) থেকে এসেছে। কিন্তু ইসলাম মানবাধিকারের ধারণা ১৪০০ বছর আগেই প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা ও নৈতিকতার একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড রয়েছে এবং এটি আল্লাহ প্রদত্ত (Divine origin), যা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

ইসলামে মানবাধিকারের মূল উৎস:

আল-কুরআন

হাদিস

ইজমা ও কিয়াস

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।”— (সূরা আল-ইসরা ১৭:৭০)

এই আয়াতটি মানব মর্যাদার সার্বজনীনতা প্রমাণ করে।

৬.২ ইসলামি আইনে মানবাধিকার

ইসলামি শরিয়াহ মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে।

“এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব

মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।"
— (সূরা মায়িদা ৫:৩২)

২. ধর্মের স্বাধীনতা

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
"দ্বীন/ধর্ম/ ইসলামে কোনো জবরদস্তি নেই।"— (সূরা বাকারা ২:২৫৬)

৩. বুদ্ধির অধিকার
মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪. সম্পদের অধিকার
"তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।"
— (সূরা নিসা ৪:২৯)

৫. বংশধারার অধিকার

হাদিস বর্ণিত হয়েছে:
"তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান একে অপরের জন্য হারাম।"
— (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সা.) ঘোষণা করেন:
সব মানুষ সমান, আরব-অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই,
নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়
এটিকে আধুনিক মানবাধিকারের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

৬.৩ সেকুলার আইনে মানবাধিকার

সেকুলার আইনে মানবাধিকার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় না। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বেহায়াপনা উশৃংখলা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। ইদানিং লক্ষ্য করা যায় যে নারী অধিকার নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ভোগ্যপন্যের মতো বাজারে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে My body My Choice, আমার শরীর আমার অধিকার। যে কারণে নারী পুরুষ সম-অধিকারের বাণী গেলানো হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পুরুষ ও নারীকে ভিন্ন অবয়বে ও আকৃতিতে শারীরিক গড়নে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় একটি ঘরে ১টি ভারি সরিষার বস্তা রয়েছে ও ১ বস্তা সরিষা ছিটানো রয়েছে। এখন সেখানে একজন পুরুষ আর একজন মহিলা প্রেরণ করলে কে কোন কাজটি বেছে নিবে। বলা বাহুল্য যে পুরুষ ব্যক্তিটি বস্তাটি কাধে নেওয়ার দায়িত্বটি বেছে নিবে এবং মহিলাটি নিশ্চিতরূপে ভারি কাজটি ব্যতীত নিচে ছড়িয়ে রাখা সরিষাগুলি পরিষ্কার করার দায়িত্বটি বেছে নিবে। মানুষের সাইকোলজি এটাই যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের আকৃতি অনুযায়ী ও পুরুষ ও মহিলা ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে এজন্য একই কাজ বা চাপ পুরুষ গ্রহণ করতে পারলেও মহিলার দ্বারা করা সম্ভব হয় না। তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে সেটা এভারেজে ধরলে অনেক কম যাদের পুরুষ হরমোন বেশি থাকার কারণে বা বাহ্যিক আকৃতি একটু কঠিন থাকার কারণে পুরুষের সমপর্যায়ে কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু তাই বলে ওই কতিপয় মহিলার সাথে সমাজের সব মহিলাদের তুলনা করাটা তো উচিত হবে না। পশ্চিমা দেশগুলোর সেকুলারিজমের নারীবাদী মনোভাব তাদের পুঁজিবাদীতে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগায় মহিলাদেরকে পণ্যরুপে বাহিরে এনে। এতে তাদেরকে বাহ্যিকভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হলেও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাহিরে পুরুষের সাথে ১২ কাজ করার পর আবার বাড়িতে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সেকুলার ধর্ম একজন নারীকে একজন পুরুষের সাথে সমঅধিকারের জন্য লড়তে বাধ্য করছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এই শরীর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আমাদেরকে আমানত হিসাবে দিয়েছেন, আমাদের উচিত এই আমানত সঠিকভাবে পরিচালনা করা আল্লাহর বিধান পালনের মাধ্যমে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

রাষ্ট্র ও ধর্মে পৃথক বলা হয় কিন্ত সেকুলারিজমকে সতন্দ্র ধর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়। আইনের উৎস হলো সংবিধান ও মানবিক যুক্তি এবং নামে মাত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার প্রদান। নামে মাত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ, কিন্তু বাস্তবে সেকুলারিজমকে সতন্দ্র ধর্ম হিসাবে মেনে এই ধর্মের সকল কার্যাবলি বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা পেতে মেনে নেওয়া। তবে সেকুলার আইনে নীতি নৈতিকতার ভিত্তি সময় ও সমাজভেদে যেকোনো পরিস্থিতে পরিবর্তনশীল।

৬.৪ তুলনামূলক পার্থক্য

বিষয় — ইসলামি আইন — সেকুলার আইন

উৎস— আল্লাহর বিধান — মানব রচিত

স্থায়িত্ব— অপরিবর্তনীয় — পরিবর্তনশীল

নৈতিকতা — ধর্মভিত্তিক — সামাজিক/মানবিক

স্বাধীনতা — সীমাবদ্ধ (নৈতিকতার মধ্যে) — ব্যাপক

জবাবদিহিতা — দুনিয়া + আখিরাত — কেবলমাত্র দুনিয়া

ইসলাম মানবাধিকারে ভারসাম্য রাখে আল্লাহর হক ও বান্দার হকে সামন্জস্য বিধান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ।

সেকুলার আইন স্বাধীনতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর ও বান্দার হক নষ্ট করে, ফলে বাস্তবে সাময়িক সুবিধা পেলেও নৈতিক সংকট ও বিশৃঙ্খলা সামাজিক অবক্ষয় তৈরি হয়।

৭. শাস্তি ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

৭.১ ইসলামি শাস্তি ব্যবস্থা

১. হুদুদ

হুদুদ শব্দটি আরবি "হাদ" থেকে এসেছে, যার অর্থ সীমা বা নির্ধারিত সীমানা। ইসলামি শরিয়তে হুদুদ বলতে সেই সব অপরাধ ও শাস্তিকে বোঝায়, যেগুলোর শাস্তি আল্লাহ কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যা মানুষের দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

শাস্তির বৈশিষ্ট্য
আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি
শাস্তি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়
প্রমাণের মান অত্যন্ত কঠোর হতে হবে
সন্দেহ থাকলে শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না

প্রধান হুদুদ অপরাধসমূহ:

১. চুরি
শাস্তি: হাত কেটে দেওয়া (নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে)

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :
"চোর পুরুষ ও চোর নারী—তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসেবে..."— সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৮

২. যিনা /ব্যভিচার
অবিবাহিত: ১০০ বেত্রাঘাত
বিবাহিত: প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (হাদিসভিত্তিক)

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :
“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।” — সূরা আন-নূর ২৪:২

৩.মিথ্যা অপবাদ
শাস্তি :৮০ বেত্রাঘাত

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :
“যারা সচ্চরিত্র নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারপর তারা চারজন সাক্ষী আনতে পারে না তবে তাদেরকে ৮০ টি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনোই তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করো না আর এরাই হল ফাসিক” — সূরা আন-নূর ২৪:৪

৪. মদ্যপান
শাস্তি: ৪০-৮০ বেত্রাঘাত

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :
“হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ অপবিত্র ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।”
— (সূরা আল-মায়িদা ৫:৯০)

৫. ডাকাতি/সন্ত্রাস
শাস্তি: হত্যা, ক্রুশবিদ্ধকরণ, হাত-পা কাটা বা নির্বাসন করা
উদ্দেশ্য
সমাজে ভয় সৃষ্টি করে অপরাধ প্রতিরোধ
নৈতিকতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা
আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং হত্যা, ছিনতাই ও ডাকাতির মাধ্যমে জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি ও শত্রুতার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা ছাড়া হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে কিংবা তাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে দেয়া হবে এবং আবার করলে তার বাম হাত ও ডান পা কেটে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশান্তর করা হবে। এটি শুধু তাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং পরকালে তো রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।”

— সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৩

সাধারণত ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় চুরির শাস্তি হিসাবে হাত কর্তিত হবে এবং যিনার শাস্তিস্বরুপ বেত্রাঘাত প্রদান করা হবে আর ব্যাভিচার প্রমাণিত হলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে আর প্রমাণিত না হলে অপবাদ প্রদানকারীদেরকে বেত্রাঘাত প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি কার্যকর করা হবে এটাই নির্ধারিত শাস্তি।

এতে সমাজের এরকম স্থায়ী শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ যেন এই ধরনের গুনাহের কার্যকলাপ হতে বিরত থাকে। এতে সমাজে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়।

ব্যাভিচারের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদন্ডের এই কঠোর ব্যবস্থা করা হয়েছে মানুষের বংশপরিচয় রক্ষা করার জন্য।

ইসলাম “নাসাব” (বংশ পরিচয়) রক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, ব্যভিচারের ফলে সন্তানের প্রকৃত পিতা নির্ধারণ কঠিন হয়ে যায় এতে উত্তরাধিকার, পরিবার ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে।

ব্যভিচারের কঠোর শাস্তির মূল উদ্দেশ্য:

বংশধারা সংরক্ষণ, পরিবার ও সমাজ রক্ষা, নৈতিকতা বজায় রাখা ও অপরাধ প্রতিরোধ। মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে যেন কোন বেকচুর ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন না হয় এজন্য অপবাদ প্রমাণিত করতে না পারলে অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিকে ৮০ বেত্রাঘাত শাস্তিস্বরূপ প্রদান বাধ্যতামূলক। ফলে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির সম্মুখীন হবে না, কোনো ব্যাক্তি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ারও সাহস করবে না।

৭.২ কিসাস

কিসাস অর্থ "প্রতিশোধ" বা "সমপরিমাণ প্রতিফল"। এটি এমন একটি শাস্তি ব্যবস্থা যেখানে অপরাধীর ওপর ভুক্তভোগীর কৃত অপরাধের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

যেমন: হত্যা অথবা শারীরিক আঘাত
কিসাসের মূলনীতি হলো "জীবনের বদলে জীবন" "চোখের বদলে চোখ"
কিসাসের বিকল্প – ইসলামে কিসাসের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর পরিবারকে তিনটি অপশন দেওয়া হয়:
১. কিসাস কার্যকর করা (প্রতিশোধ নেওয়া)
২. দিয়াত বা রক্তপণ আদায়/গ্রহণ
৩. সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেওয়া

কিসাস সাধারণত ব্যক্তিগত অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়,
ভুক্তভোগীর পরিবার এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে,
আবার সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করারও সুযোগ আছে।

মূলত কিসাসের মূল উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা,
প্রতিশোধের সীমা নির্ধারণ করা ও ক্ষমাশীলতা উৎসাহিত করা।
ভুক্তভোগীর হক সঠিকভাবে আদায় করা ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যেন কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধ করার আগে তার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়।

আমাদের সমাজে সেকুলার বিচার ব্যবস্থা থাকার কারণে এখন ইসলামি শরিয়া মোতাবেক আইন কার্যকর করা হয় না ফলে সমাজে অপরাধ ক্রমেই বাড়ছে তো বাড়ছেই। এখন সমাজে অহরহ ধর্ষণ, হত্যাসহ যাবতীয় অবর্ণনীয় অপরাধ ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না সঠিক বিচার প্রদান।

বাংলাদেশে অপরাধ ও বিচারাধীন মামলার পরিসংখ্যানিক করুন অবস্থা কিছুটা নিচে উল্লেখ করা হলো:

★ ১৯৭১–বর্তমান (স্বাধীনতার পর থেকে মোট চিত্র)
মোট বিচারাধীন মামলা (৩৫–৪০ লাখ+)
হত্যা মামলা দায়ের (২–৩ লাখ+)
বিচারাধীন হত্যা মামলা (২০–৩০ হাজার+)

★২০১৫–২০২৩ (সাম্প্রতিক সময়)
প্রতি বছর হত্যা মামলা (৩,৫০০–৪,৫০০+)
প্রতি বছর ধর্ষণ মামলা (১,০০০–১,৮০০+)
নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা (১৫,০০০–২০,০০০+/বছরে)

এই সময়ের জমে থাকা মামলা:
ধর্ষণ (৫,০০০–১০,০০০+ বিচারাধীন)
নারী নির্যাতন (৫০,০০০+ বিচারাধীন)

★ নির্দিষ্ট বছরভিত্তিক (উদাহরণ)
২০১৮
ধর্ষণ ~৭৩০+
হত্যা ~৩,৫০০+
২০২০
ধর্ষণ ~১,৬০০+
হত্যা ~৩,৭০০+
২০২২
ধর্ষণ ~১,৪০০+
হত্যা ~৪,০০০+
২০২৩
হত্যা ~৪,২০০+

নারী নির্যাতন ১৮,০০০+ মামলা

★ সন্ত্রাসী হামলা (২০০৫–২০২৩)
বড় বড় ঘটনা (যেমন জেএমবি হামলা, হলি আর্টিজান)
মোট মামলা – শতাধিক+
বিচারাধীন – অনেকগুলো এখনো চলমান রয়েছে

* ২০১৫–২০২৩ পর্যন্ত হাজার হাজার হত্যা ও ধর্ষণ মামলা জমে আছে, আর স্বাধীনতার পর থেকে লাখ লাখ মামলা এখনো নিষ্পত্তিহীন রয়েছে ।
* ২০১৬ সাল থেকে ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্রায় ৬০০০ অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, যার মধ্য ১৮০০ দলবদ্ধ ধর্ষণ, ২৩৬ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার এবং ৪৪ জন আত্মহত্যা করেছেন —দ্য ডেইলি স্টার

এই মামলাগুলোর যদি ন্যায় ও ইনসাফের সহিত সঠিকভাবে শরিয়া আইনে বিচার করা হতো তাহলে সমাজে অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা নিশ্চিতই কমে আসত কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিসংখ্যানিক তথ্য বাড়তেছে তো প্রতিনিয়তই। ইসলামি বিচার ব্যবস্থা ছাড়া সমাজে সুশৃঙ্খল ভাবে ন্যায় ও ইনসাফ ও নীতি নৈতিকতার সহিত জীবন যাপন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ইসলামেই একমাত্র শান্তিপূর্ণ ভাবে মুসলিম ও অমুসলিম অর্থাৎ মানবজাতির উত্তোরন সম্ভব।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓأُولِى الْأَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থঃ হে বিবেকসম্পন্নগণ! কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্যে জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।
— (আল-বাকারাহ - ২:১৭৯)

৩.তাজির

তাজির হলো এমন শাস্তি, যা কুরআন বা হাদিসে নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। রাষ্ট্র বা বিচারক পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এই শাস্তি নির্ধারণ করে থাকেন।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহ: ছোটখাটো অপরাধ, হুদুদ বা কিসাসের শর্ত পূরণ না হলে, সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কাজ ইত্যাদি।

শাস্তির ধরন: সতর্কবাণী, জরিমানা, কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত (সীমিত) সামাজিক শাস্তি ইত্যাদি।

বিচারের বৈশিষ্ট্য: নমনীয়, বিচারকের বিবেচনাধীন, সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য ও পরিবর্ধনযোগ্য।

শাস্তির উদ্দেশ্য: ব্যাক্তির সংশোধন, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করা ইত্যাদি।

৭.২ শাস্তির উদ্দেশ্য

ইসলামে শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়, বরং:

১. সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

২. অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ

৩. ব্যক্তির সংশোধন

৪. সমাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

ইসলামি আইনের সামনে ধনী দারিদ্র ক্ষমতাসীন ক্ষমতাহীন বলিষ্ট হীন সবাই সমান। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম।

যেমন তাজিরের শাস্তির ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো ন্যায়পরায়ণ আল্লাহভীরু ব্যক্তি কোনো অপরাধ করে থাকেন যাকে সামান্য নসিহত প্রদান করাই যথেষ্ট কিন্তু যদি একই অপরাধের অপরাধী কোনো সাধারণ ব্যক্তি যাকে একটু কঠোর শাস্তি প্রদান করলে

অতপর তার পরিবর্তন সম্ভব হবে তাহলে তাকে সেই শাস্তি প্রদান শরিয়ত সম্মত বিষয়। এখানেও দুজনের মধ্যেই সমতা রক্ষা করা হয়েছে। যে যেই শাস্তির উপযুক্ত তাকে সমপরিমাণ শাস্তিই প্রদান করা হয়।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি দেওয়াটাই মূল উদ্দেশ্য নয় বরং ব্যক্তির সংশোধন, সমাজ থেকে উক্ত অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করা এবং সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাও মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩ সামাজিক ভারসাম্য ও নিরাপত্তা

ইসলামি আইন সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করে:

- ধনী-গরিব সমতা
- অপরাধ দমন
- নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা
- পরিবার ও সমাজ রক্ষা

যে ব্যক্তি যে ধরনের শাস্তির যোগ্য তাকে সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা। অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা দমন করা ও স্বাভাবিক জীবনে ফেরা নিশ্চিত করা। সামাজিকভাবে নীতি নৈতিকতার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা। ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। সর্বোপরি পরিবার ও সমাজ রক্ষা করা ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যেমন যিনা ও ব্যাভিচারের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে পরিবার তথা বংশ পরিচয় সংরক্ষণ করার মাধ্যমে পারিবারিক সামাজিক ভীত মজবুত রাখা।

খলিফা উমর (রা.)-এর সময় — দুর্ভিক্ষে চুরির শাস্তি বন্ধ রাখা হয় এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে বিচার সাধারণত মানবিক ও প্রেক্ষাপটনির্ভর হয়ে থাকে।

শরিয়া আইন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও সামাজিক নিরাপত্তা একসাথে নিশ্চিত করা হয়।

অন্যদিকে, সেকুলার আইন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বেশি গুরুত্ব দিলেও তা সবসময় নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে। পারিবারিক ও সামাজিক ভীত নষ্ট করে দেয়।

সেকুলার ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে ছাড়াই একসাথে থাকা (cohabitation) বা লিভিং রিলেশনে বর্তমানে খুবই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ ওখানে বিয়ের পর ডিভোর্স হলে সেকুলার আইনত স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক সম্পদের অধীকারি হয়। এজন্য প্রায় ৬০–৭০% দম্পতি বিয়ের আগে একসাথে থাকে। বিয়ে ছাড়া সন্তানের জন্মের হারও বেশি—মোট জন্মের প্রায় ৪০% এ ধরনের জারৎ সন্তান হয়ে থাকে।
এসব শিশু আইনগতভাবে সম্পূর্ণ অধিকার পায়। অন্যদিকে যৌন নির্যাতন একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষের বেশি মানুষ এর শিকার হয় এবং গবেষণা অনুযায়ী প্রতি ৫ জন নারীর মধ্যে ১ জন জীবনের কোনো না কোনো সময়ে যৌন সহিংসতার মুখোমুখি হতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় জরিপ অনুযায়ী—
প্রায় ২০–২৫% কিশোর-কিশোরী ১৫ বছর বয়সের মধ্যে প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা পায়
প্রায় ৫৫–৬০% ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ভার্জিনিটি হারায়
প্রায় ৭৫–৮০% ২০ বছর বয়সের মধ্যে প্রথম যৌন সম্পর্কের অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে

সূত্র:
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Youth Risk Behavior Survey (YRBS)
National Survey of Family Growth (NSFG) – যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার ও প্রজনন সম্পর্কিত জাতীয় জরিপ
এসব গবেষণায় দেখা যায়, বর্তমানে যৌন আচরণের ক্ষেত্রে সম্মতি, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাই গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলাফল যা পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের।

তাই বলা যায়:

ইসলামি আইন = নৈতিকতা + ন্যায় + মানবাধিকার

সেকুলার আইন = স্বাধীনতা + মানবিক যুক্তি

৮. আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। আইন যদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত না হয়, তবে তা কেবল তাত্ত্বিক কাঠামোতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেকুলার ও ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আইনের উৎস, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং বাস্তবায়ন কাঠামোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় আইন আল্লাহর বিধান হিসেবে বিবেচিত, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দেন আমানত তার হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়বিচার করবে।” — (সূরা আন-নিসা ৪:৫৮)

অন্যদিকে সেকুলার বিচার ব্যবস্থায় আইন মানবসৃষ্ট এবং সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

৮.১ বিচারিক কাঠামো

সেকুলার বিচার ব্যবস্থায় সাধারণত তিন স্তরের আদালত ব্যবস্থা বিদ্যমান—নিম্ন আদালত,আপিল আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত। এই কাঠামো বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ প্রদান করলেও দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে। ফলে

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় বিচারিক কাঠামো তুলনামূলকভাবে সরল। প্রাথমিক যুগে কাজী সরাসরি বিচার প্রদান করতেন এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা হতো। খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা একটি আদর্শ রূপ ধারণ করে।

৮.২ বিচারকদের ভূমিকা

সেকুলার ব্যবস্থায় বিচারকরা সংবিধান ও প্রণীত আইনের আলোকে বিচার পরিচালনা করেন। তাদের নিরপেক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবে অনেক সময় বাহ্যিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেকুলার ব্যবস্থায় বিচারককে অর্থেরবিনিময়ে খরিদ করা সম্ভব। ফলে ভুক্তভোগী সঠিক বিচার না পাওয়ার সম্ভবনা বেশি।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় বিচারককে (কাজী) উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন ও দ্বীনদার হতে হয়।
রাসূল (সা.) বলেন:
“বিচারক তিন প্রকার—একজন জান্নাতে যাবে এবং দুইজন জাহান্নামে যাবে। যে সত্য জেনে বিচার করে, সে জান্নাতে যাবে।” (আবু দাউদ)

এতে বিচারকের জ্ঞান, সততা ও নৈতিকতার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়।

৮.৩ প্রমাণ ও সাক্ষ্য ব্যবস্থা

সেকুলার আইনে ফরেনসিক, ডকুমেন্টারি এবং সাক্ষ্য প্রমাণের সমন্বয়ে বিচার পরিচালিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে অপরাধী ব্যক্তি আইনে ফাক ফোকর দিয়ে বের হয়ে যায়।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় প্রমাণের ক্ষেত্রে কঠোর মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়। প্রমাণ পাকাপোক্ত হওয়ার পর শাস্তি প্রদান করা হয়।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:
“তোমরা ন্যায়বিচারের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য দাও।” —(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)

এখানে সাক্ষীর সততা ও চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যা সাক্ষ্য ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এটার জন্য শাস্তিও নির্ধারিত রয়েছে।

৯. সামাজিক অধপতন ও বিচার ব্যবস্থার প্রভাব

বিচার ব্যবস্থা একটি সমাজের মূল ভিত্তি। যখন বিচার সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বজায় থাকে। কিন্তু বিচার ব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিলে তা সমাজের সর্বস্তরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে যখন অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হয় না, তখন মানুষ অন্যায় করতে ভয় পায় না। ফলে অপরাধের হার বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
বিচারহীনতা ধীরে ধীরে সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য ভুলে যায় এবং অন্যায়ের প্রতি সহনশীল হয়ে ওঠে। এতে সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্নীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা মন্দকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”— (সূরা আন-নাহল ১৬:৯০)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা। বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা এই নির্দেশনার বিরোধিতা করে।

৯.১ সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ

সামাজিক অবক্ষয় হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না; বরং এটি বিভিন্ন কারণের সম্মিলিত ফল। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো—
১. বিচারহীনতার সংস্কৃতি
যখন অপরাধ করে কেউ শাস্তি পায় না, তখন সমাজে “অপরাধ করলেও কিছু হয় না” — এই ধারণা তৈরি হয়। এতে অন্যরাও অপরাধে উৎসাহিত হয়। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় আইনের ফাক ফোকর দিয়ে বের হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকায়।

পূর্বের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত।" — (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২. দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব

যখন বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা দুর্নীতি প্রবেশ করে, তখন ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হয়। এতে যোগ্য ব্যক্তি বঞ্চিত হয় এবং অপরাধীরা রক্ষা পায়। রাজনৈতিক পদ পদবীর ক্ষমতা বলে শাস্তির হাত থেকে অপরাধী ব্যক্তি রক্ষা পায়।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ নিজেরা অন্যায় ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদের (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পারে। "— (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৮৮)

৩. আইনের অসম প্রয়োগ

আইন যদি সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না হয়, তাহলে সমাজে বৈষম্য তৈরি হয়। এতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা জন্ম নেয়। সাধারণ জনগনের আইনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়।

আইনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র তবে আল্লাহ উভয়ের জন্য ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো অথবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্মুক অবগত।" — (সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)

৪. নৈতিক শিক্ষার অভাব

নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে মানুষ সঠিক-ভুলের পার্থক্য হারিয়ে ফেলে। এতে সমাজে অসৎ কাজ বৃদ্ধি পায়। নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত মানদণ্ড না মেনে সৃষ্টির দাসত্ব করলে নৈতিক অবক্ষয় হওয়া তো বাঞ্ছনীয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

“আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি।”

— (মুসনাদ আহমদ)

৫. বিচার বিলম্ব

বিচার দীর্ঘদিন ঝুলে থাকলে অপরাধীরা আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে পার পেয়ে যায়। এতে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে, মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুকাদ্দিমা-তে উল্লেখ করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি ও বিচারহীনতা একটি সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ।

৯.২ বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা ও প্রভাব

বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা সমাজে বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. অপরাধের হার বৃদ্ধি

যখন শাস্তি নিশ্চিত হয় না, তখন অপরাধীরা আরও সাহসী হয়ে ওঠে এবং অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

২. জনগণের আস্থা হ্রাস

মানুষ যখন দেখে বিচার পাওয়া যায় না, তখন তারা রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। ফলে বিচারের আশায় বসে থাকে না।

৩. সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

ন্যায়বিচার না থাকলে সমাজে অস্থিরতা, সহিংসতা ও সংঘাত বৃদ্ধি পায়। অপরাধের পর অপরাধীকে শাস্তির আওতায় না আনা হলে জনগণের বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রতি আস্থা সংকটের সৃষ্টি হয়।

৪. আইনের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে

আইনের শাসন দুর্বল হলে সমাজে শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আধিপত্য বিস্তার করে আর দরিদ্র ব্যক্তিরা সাফার করে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

“আর তোমরা ফিতনা (অরাজকতা) থেকে বাঁচো, যা বিশেষভাবে শুধু যালিমদের উপরই আপতিত হবে না, আর জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ আজাব প্রদানে কঠোর”— (সূরা আল-আনফাল ৮:২৫)

সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নৈতিকতার জন্য শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য। কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্ট যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা একটি ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব। বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা শুধু আইনি সমস্যা নয়, এটি পুরো সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সমাজের যাবতীয় শান্তি শৃঙ্খলা ধ্বংসের জন্য দায়ী শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা বা অরাজকতা।

৯.৩ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার সম্ভাব্য সমাধান

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ ও জীবন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা, যার মূল লক্ষ্য হলো অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধীর অপরাধ প্রতিরোধ, ভুক্তভোগীকে যথাযথ ন্যায্য অধিকার প্রদান এবং সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এই ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে, যা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে সমাজ থেকে অন্যায়, অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা অনেকাংশে

কমে যেতে পারে। নিচে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার কিছু সম্ভাব্য সমাধান আলোচনা করা হলো—

১. দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় দ্রুত বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিলম্বিত হলে তা ভুক্তভোগীর জন্য কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে এবং অপরাধীরা আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে শাস্তি এড়াতে পারে। তাই ইসলাম স্বাক্ষ্য ও প্রমাণ বিবেচনায় রেখে দ্রুত ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেয়।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

“আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায়বিচার সহকারে বিচার কর।”— (সূরা আন-নিসা ৪:৫৮)

এই আয়াত নির্দেশ করে যে বিচার শুধু ন্যায়সঙ্গতই নয়, সময়োপযোগী হওয়াও জরুরি। যেন ভুক্তভোগী ও সমাজে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিক হিসাবে থাকে।

২. কঠোর ও ন্যায়সঙ্গত শাস্তি

ইসলামে শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়, বরং অপরাধ প্রতিরোধ এবং সমাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাই অপরাধ অনুযায়ী নির্ধারিত শাস্তি (হুদুদ, কিসাস ইত্যাদি) প্রয়োগ করলে অপরাধ প্রবণতা কমে যায়। ন্যায়সঙ্গত শাস্তি সমাজে জীবন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৩. নৈতিকতা ও তাকওয়ার বিকাশ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা শুধু বাহ্যিক শাস্তির উপর নির্ভর করে না; বরং মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি (তাকওয়া) সৃষ্টি করাকে গুরুত্ব দেয়। যখন মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও আল্লাহর ভয় থাকে, তখন সে নিজ থেকেই অন্যায় থেকে বিরত থাকে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:
“নিশ্চয়ই আল্লাহভীতি (তাকওয়া) অবলম্বনকারীদের সাথেই আল্লাহ আছেন”— (সূরা আন-নাহল ১৬:১২৮)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।”— (সহীহ বুখারী)

এ থেকে বোঝা যায়, নৈতিকতার উন্নয়ন অপরাধ কমানোর একটি মৌলিক উপায়। মানুষের আত্মীক উন্নয়ণ অপরাধ প্রবণতা কমায়।

৪. আইনের সামনে সকলের সমতা
ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। ধনী-গরিব, ক্ষমতাবান-দুর্বল— কারও জন্য আলাদা আইন নেই।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, তারা ক্ষমতাবানদের অপরাধ ক্ষমা করত এবং দুর্বলদের শাস্তি দিত।”
— (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস আইনের সমতা ও ন্যায়বিচারের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ধনী গরিব ক্ষমতাবান বা দূর্বলদের জন্য ভিন্ন কোনো আইন বা বিচার ব্যবস্থ নেই, আইন সবার জন্যই সমান।

সেকুলার ও ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মধ্যে কাঠামোগত ও নীতিগত অনেক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। উভয়ের মূল লক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হলেও সেকুলার ব্যবস্থা নিজেদেরই আইনি মারপ্যাচে ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রদানে অক্ষম। তবে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা আল্লাহভীতি, নৈতিকতা, দ্রুত বিচার এবং কঠোর ও ন্যায়সঙ্গত শাস্তির মাধ্যমে একটি অধিক স্থিতিশীল, সুশৃঙ্খল ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

অতএব, ইসলামি বিচার ব্যবস্থার এই নীতিগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে ন্যায়, শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।